মতামত : ভারত

কৃষক আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ও বিশ্বাসের ঘাটতি

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লি চলো অভিযানে প্রধানত শামিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরালার কৃষকেরা রয়টার্স

রাজধানী দিল্লি কার্যত অবরুদ্ধ। হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোয় লক্ষাধিক কৃষক জড়ো হয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে করোনার জন্য সংক্ষেপিত সংসদীয় অধিবেশনে কৃষি ও কৃষি বিপণনসংক্রান্ত বিতর্কিত যে তিনটি বিল পাস করা হয়, তা প্রত্যাহারের দাবিতেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকদের এই ‘দিল্লি চলো’ অভিযান। কৃষকদের আশঙ্কা, নতুন আইন স্বাধীনতাই শুধু হরণ করবে না, তাঁদের বড় শিল্পোদ্যোক্তাদের দাসানুদাস করে তুলবে। নীলচাষিদের দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে। হতে হবে ক্রীতদাস।

দিল্লি চলো অভিযানে প্রধানত শামিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরালার কৃষকেরা। তাঁরা তৈরি হয়েই এসেছেন। ট্রাক ও ট্রাক্টর-ট্রেলারকে গড়ে তুলেছেন অস্থায়ী আস্তানা

প্রথম আলো

এক বছর আগের শীতকালে এই রকম অবস্থান আন্দোলন শুরু হয়েছিল দিল্লির শাহিনবাগে। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে দাদি-নানিরা অবরোধ করেছিলেন সড়ক। দাবি ছিল নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার। তিন মাসের বেশি চলা শান্তিপূর্ণ সেই অবরোধ সরাতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে একটিবারের জন্যও সরকার কথা বলেনি। করোনার আতঙ্ক শুরু হওয়ার পর অবরোধ উঠে যায়। এবার করোনা সংক্রমণ উপেক্ষা করে কৃষকেরা দিল্লি অভিযানে এসেছেন। পার্থক্য এটুকুই, কালক্ষেপ না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আলোচনার বার্তা পাঠিয়েছেন। যদিও আন্দোলনের নেতারা তা অগ্রাহ্য করে বলেছেন, শর্তাধীন প্রস্তাব গ্রহণ অসম্ভব। সরকারকে আলোচনায় বসতে হবে তাঁদের অবস্থানের জায়গায় এসে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শর্ত ছিল, সীমান্ত মুক্ত করে কৃষকেরা সীমান্তবর্তী এলাকা বুরারি চলে যান। কৃষকদের আশঙ্কা, নির্ধারিত জায়গায় চলে গেলে সেখানেই তাঁদের বন্দী করে রাখা হবে। এমন আশঙ্কা বা সন্দেহের কারণ, সাতটি স্টেডিয়ামকে অস্থায়ী জেলখানায় রূপান্তরের প্রস্তাব। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন্দ্রের হাতে স্টেডিয়াম তুলে দিতে রাজি হননি।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দ্বিতীয় কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘মন কি বাত’। নতুন কৃষি আইন কতটা কৃষকদের স্বার্থে, এই সংস্কার কীভাবে দীর্ঘদিনের সমস্যা সুরাহা করবে, কীভাবে কৃষকদের মধ্যস্বত্বভোগী বা মিডলম্যানদের হাত থেকে বাঁচাবে, বাজারের ব্যাপ্তি ঘটাবে এবং কৃষকদের শৃঙ্খলমুক্ত করে তুলবে, রোববার তিনি তা ব্যাখ্যা করেন। কৃষকেরা মনে করছেন, সরকার কতখানি অনমনীয়, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তা স্পষ্ট।

> **শাহিনবাগের মতো কঠোর অবস্থান ধরে রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন। শাহিনবাগ আন্দোলনকে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মেরুকরণে ব্যবহার করেছিল। কৃষক আন্দোলন সেই সুবিধা দেবে না। এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুই তরফের বিশ্বাসের ঘাটতি কীভাবে মেটে, সেটাই এখন দেখার**

স্পষ্ট আরও একটি বিষয়। ট্রাস্ট ডেফিসিট বা বিশ্বাসের ঘাটতি। এই সরকার আজ পর্যন্ত যে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে কারও সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ দেখায়নি। সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেনি। ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টাও করেনি। নোট বাতিল, অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু, নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, এনআরসি তৈরি কিংবা করোনার মোকাবিলায় তিন সপ্তাহের জন্য দেশজোড়া লকডাউন—সব সিদ্ধান্তই সরকার নিয়েছে একতরফাভাবে। আলোচনা না করে। এই কৃষি আইনও তেমন। এতগুলো সংগঠন। কারও সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। সবচেয়ে বড় কথা, একটি ক্ষেত্রেও সরকার তার ভুল স্বীকার

বাড়িয়ে তুলেছে। গণতন্ত্রের পক্ষে যা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

কৃষি আইনের বিরোধিতা চলছে সেই সেপ্টেম্বর থেকে। আর্যাবর্তে বেশি, দাক্ষিণাত্যে তুলনায় কম। পাঞ্জাবে তো রেল ও সড়ক অবরোধও অব্যাহত। কেন্দ্রীয় আইন চালু না করতে বিরোধী রাজ্য সরকার সচেষ্ট। তবু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কেন্দ্র আলোচনায় বসেনি। অগত্যা 'দিল্লি চলো' অভিযান। অভিযান বানচাল করতে শাসকের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল হরিয়ানা ও দিল্লিতে। কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে লক্ষাধিক কৃষক আজ দিল্লির দোরগোড়ায়। সরকার নমনীয়। আন্দোলনের পরবর্তী গতিপ্রকৃতি নির্ভর করছে সরকারি সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের ঘাটতির ওপর।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ভারতের মোট খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০ মিলিয়ন টন। ৭০ বছর পর উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ শতাংশের কম। সংস্কারের অভাব ও সবুজ বিপ্লবের সুফল অন্তর্হিত হওয়া ভারতের শস্যভান্ডার রাজ্যগুলোয় চরম হতাশার জন্ম দিয়েছে। অসন্তোষ থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রতিবছর চাল, গম, আখ, তুলাসহ বিভিন্ন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেঁধে দেয়। এই প্রথা ক্রমেই এক রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। নতুন আইনে সহায়ক মূল্য নিয়ে কিছু বলা নেই। উত্তর ভারতে কৃষিপণ্যের বেচাকেনা হয় সরকার পরিচালিত বাজার ব্যবস্থায় বা 'মান্ডি'তে। নতুন আইনে কৃষিপণ্যকে এই ব্যবস্থা থেকে উন্মুক্তই শুধু করা হয়নি, ফসল বা শস্য মজুতের ঊর্ধ্বসীমাও তুলে দেওয়া হয়েছে। চুক্তি চাষ বৈধ হয়েছে। অত্যাবশ্যক পণ্যের আওতামুক্ত হয়েছে চাল, ডাল, দানাশস্য, আলু, পেঁয়াজ ও তৈলবীজ। সরকারের দাবি, এর ফলে বাজার উন্মুক্ত হবে। বড় উদ্যোগপতিরা কৃষিপণ্যে আগ্রহী হবেন। বিনিয়োগ বাড়বে। মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালরাজ শেষ হবে। উপকৃত হবেন চাষি।

কৃষককুল এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁরা মনে করছেন, আইনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্দিষ্ট না থাকায় বড় সংস্থা কৃষকদের বাধ্য করবে তাদের বাঁধা দামে ফসল বিক্রি করতে। চুক্তি চাষ তাঁদের নিজ জমিতে শ্রমিক করে তুলবে। মান্ডি ব্যবস্থার অবসানে ফসল বাজারজাত করতে বহুদূর পাড়ি দিতে হবে। কৃষকের বদলে উপকৃত হবে বেসরকারি ও বহুজাতিক সংস্থা।

শাহিনবাগের মতো কঠোর অবস্থান ধরে রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন। শাহিনবাগ আন্দোলনকে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মেরুকরণে ব্যবহার করেছিল। কৃষক আন্দোলন সেই সুবিধা দেবে না। এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুই তরফের বিশ্বাসের ঘাটতি কীভাবে মেটে, সেটাই এখন দেখার।

● **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়** *প্রথম আলোর* নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

শান্তনু দে

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই দলবদলের হিড়িক। সকালে তৃণমূল। বিকেলে বিজেপি। একই উঠোনের দুই দালান। তৃণমূলের সাবেকদের নিয়ে গঠিত বিজেপির রাজ্য কমিটি। আর তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে বিজেপির গন্ধ। বিজেপির সবচেয়ে বড় সাপ্লাই লাইন তৃণমূল। রাতারাতি তৃণমূলের দলীয় দপ্তরে বিজেপির ব্যানার। সন্ধ্যায় চ্যানেলে চ্যানেলে তার মুখরোচক খবর। সকালের দৈনিকে পাতাজোড়া শিরোনাম। দলবদলের তরজা। আর এই বাহারি প্রচারের আতিশয্যে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা।

রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। গত নয় বছরে এই সরকার নতুন করে ধার নিয়েছে ২ লাখ ৪৪ হাজার ১১৯ কোটি টাকা। রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের মাথায় ধার এখন ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। এই ধারের অর্থ দিয়ে কী করেছে সরকার? পরিকাঠামো উন্নয়ন? রাস্তা-ঘাট-পানীয় জল-সেচ-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বানানোর জন্য কি এই অর্থ খরচ করেছে? এককথায়—না। রেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষকদের ফসল উৎপাদনের দেড় গুণ দাম দেওয়া বা অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ ও সংখ্যা কি বেড়েছে? তাও নয়। তাহলে কী করেছে এই অর্থ দিয়ে?

রাজ্যে নিয়োগ বন্ধ স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুর্নীতির জন্য হাইকোর্টের রায়ে আপার প্রাইমারিতে মেধাতালিকা সম্পূর্ণ বাতিল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পঙ্গু করে হয়েছে নতুন বোর্ড, যা সংবিধানসম্মত নয়। দুর্নীতি, নৈরাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে।

বেপরোয়া সরকারি অর্থ লুট, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের থেকে নীল-সাদা রং কেনা, ক্লাবে-উৎসবে দেদার টাকা ওড়ানো, ইমাম-মুয়াজ্জিন-পণ্ডিতদের অনুদান, আজ মাটি মেলা, কাল সমুদ্র মেলা, পরশু পিঠা মেলা—এই হলো সরকারের কাজ। এই সময়ে রাজ্যে একটা কারখানা নতুন করে হয়নি। উল্টো বাম আমলে তৈরি বহু কারখানা বা কোম্পানি তোলাবাজির অত্যাচারে রাজ্য থেকে চলে গিয়েছে। গ্রামে প্রকল্পের টাকা লুট হচ্ছে

প্রথম আলো

সংবিধানসম্মত নয়। দুর্নীতি, নৈরাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। হয়নি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা। তাহলে কোথায় হবে কর্মসংস্থান? রাজ্যে বেড়েই চলেছে শূন্যপদের সংখ্যা। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে লক্ষাধিক। কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক ২৫ হাজারের বেশি। সরকারি-আধা সরকারি মিলিয়ে শূন্য পদ কমবেশি সাড়ে পাঁচ লাখ।

বামপন্থীরা বলছেন বিকল্পের কথা। বিকল্পের দাবিতে যে সংগ্রাম, বিকল্প সরকার হলে তার রূপায়ণ। বিকল্পের সংগ্রামে, বিকল্প সরকারের লক্ষ্যে স্লোগান হোক : কাজ, কর্মসংস্থান। কাজ দিতে না পারলে ভাতা। অতীতের মতো ফিবছর টেস্ট, এসএসসি, পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ। অবিলম্বে শূন্য পদ পূরণ। ছোট-মাঝারি শিল্পে সরকারি সহায়তা, বিনিয়োগ।

রাজ্যের মানুষ বিকল্প খুঁজছেন। মানুষ অতিষ্ঠ তৃণমূলের অত্যাচার আর লুটের রাজত্বে। বামফ্রন্টের সময় ছোট-মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান ছিল রাজ্যগুলোর মধ্যে শীর্ষে। অনেক পেছনে গুজরাট। এখন সবই সংকটে। বেশির ভাগই বন্ধ। সিঙ্গুরে ৯০ শতাংশ তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা তাড়ানোর পর আর বিনিয়োগ আসেনি। জিন্দাল ইস্পাত কারখানা পুরোপুরি বন্ধ। বছর বছর শিল্প সম্মেলন হয়েছে। বিনিয়োগ হয়নি।

রাজ্যের মজুরির হার দেশের তুলনায় বেশ কম। অবধারিত পরিণতি রাজ্য ছেড়ে শ্রমিকদের ভিন রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া। কেরালায় একজন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি দিনে ৭০০ টাকা। আর ছুতোর, রাজমিস্ত্রির মতো দক্ষ শ্রমিকের মজুরি দিনে ১ হাজার টাকার ওপরে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একজন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি দিনে ৩২৯ টাকা, আর দক্ষ শ্রমিকের ৩৯৮ টাকা।

কৃষি থেকে কৃষক উচ্ছেদ রোধে চাই পরিকল্পিত উদ্যোগ। ২০১৮-১৯ সালে রাজ্যে কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছেন ৩৪ শতাংশ কর্মরত মানুষ, ভারতের ক্ষেত্রে যে সংখ্যা প্রায় ৪৩ শতাংশ। আবার রাজ্য সরকার কৃষকদের ব্যাপক আয় বেড়েছে বলে দাবি করলেও আসলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের আয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই কম। কৃষকের অভাবী বিক্রি। আত্মহত্যা।

চাষকে লাভজনক করতে সরকারের তরফে জরুরি হলো সার ও সেচের জলের প্রসার। কৃষকের জন্য কেবল এককালীন ঋণ মওকুফ নয়। ফসলের দেড় গুণ দামের নিশ্চয়তা। কৃষি থেকে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। যাতে নিশ্চিত করা যায় ফসলের দাম। ছোট-মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ, যাতে মূল্য যোগ করা যায় কৃষি ফসলে। সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কারে জমি পাওয়া যাঁরা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সেই সঙ্গেই এপিএমসি অ্যাক্ট বাতিল। মাঠে ফসল থাকাকালেই বেসরকারি সংস্থা যাতে কৃষকদের কাছ থেকে তা কিনে নিতে পারে, সে জন্য মোদির ছয় বছর আগেই ২০১৪ সালে আইন পাস করেছে তৃণমূল সরকার। কৃষিপণ্যের বাজারে খুলে দিয়েছে বৃহৎ পুঁজি প্রবেশের পথ। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, সংস্থা, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সরকারি সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অথবা এজেন্সিকে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে

প্রথম আলো

ক্ষমতায় এসে মমতা ব্যানার্জির সরকার কৃষি সমবায়গুলোসহ প্রায় ২০ হাজার সমবায় সরকারি অধ্যাদেশ জারি করে বেমালুম বাতিল করে দেয়। এর ফলে সমগ্র বাজার চলে যায় কিছু অর্থবান ক্ষমতাশালী দালালের নিয়ন্ত্রণে।

বামফ্রন্টের আমলে গড়ে উঠেছিল কয়েক হাজার কৃষি সমবায় সংস্থা। স্থানীয় কৃষকেরাই সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই সমবায়গুলোই কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনে সরকারের কাছে সরাসরি বিক্রি করত। এই ব্যবস্থা কৃষকদের সরাসরি সরকারি সহায়তা মূল্য পেতে সাহায্য করত। ক্ষমতায় এসে মমতা ব্যানার্জির সরকার কৃষি সমবায়গুলোসহ প্রায় ২০ হাজার সমবায় সরকারি অধ্যাদেশ জারি করে বেমালুম বাতিল করে দেয়। এর ফলে সমগ্র বাজার চলে যায় কিছু অর্থবান ক্ষমতাশালী দালালের নিয়ন্ত্রণে। এরপর ২০১৭ সালে এপিএমসি আইনের পরিবর্তন করে রাজ্যের কৃষিপণ্যের বাজার ও বিপণনকে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন তিনি।

জরুরি হলো সব গ্রাম ও শহরে রেগা প্রকল্পে কাজের নিশ্চয়তা। ১০০ দিন না। ২০০ দিন। একই সঙ্গে জরুরি খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্ব। গণবণ্টনের সম্প্রসারণ। আগের সব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাকে সময়োপযোগী করা। সব মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জল। বাসস্থানের ব্যবস্থা। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যের অবসান। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা।

সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সবটাই করা দরকার বিনা মূল্যে। জনস্বাস্থ্যে সরকারকে নিতে হবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব। মহামারি ও রোগ প্রতিরোধে দিতে হবে অগ্রাধিকার। বিদ্যুতে ক্রস সাবসিডি বা পারস্পরিক ভর্তুকির মারফত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য বিদ্যুতের দাম কমানো।

সম্পদের বণ্টনের জন্য যে স্টেট ফিন্যান্স কমিশন ছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রয়োজন সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজ্য সরকার পরিচালিত রুগ্‌ণ সংস্থাগুলোর পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সরকারি কারখানা তৈরি সামগ্রী বিপণনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ। চটকল ও পাটচাষিদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ।

পরিবেশ রক্ষার জন্য বনাঞ্চল সংরক্ষণে বিশেষ প্যাকেজ। বেআইনি খনি, খাদান বন্ধ করা। বড় শহরগুলোয় সরকারি পরিবহনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-চালিত বাস ও অন্যান্য যানবাহন তার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার। স্পেশাল গ্রিন জোন নির্মাণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ। নারী নির্যাতন, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রতিরোধে শহরে ওয়ার্ড বা

প্রথম আলো

গঠন। উন্নয়নের কাজে গ্রামসভা থেকে ওয়ার্ডসভায় মানুষের অংশগ্রহণ। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পাহাড়ে সর্বোচ্চ স্বশাসনের অধিকার। গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনৈতিক মতের অধিকার। শান্তিতে ভোটদানের অধিকার। পঞ্চায়েত, পৌরসভায় নিয়মিত অবাধ নির্বাচন। গুন্ডারাজ, তোলাবাজমুক্ত রাজ্য।

শান্তনু দে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক

মতামত : চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন

কলহমুখর আওয়ামী লীগ ও নির্জীব বিএনপি

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তারেক সোলেমান। পাননি। চারবারের নির্বাচিত এই কাউন্সিলর রাগে-ক্ষোভে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনে থেকে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়েনি। ১৮ জানুয়ারি দুরারোগ্য ব্যাধিতে সোলেমান (৬০) মৃত্যুবরণ করলে আলকরণ ওয়ার্ডে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। আপাতত এই এলাকায় অন্তর্দলীয় বিরোধ, এমনকি সংঘর্ষের শঙ্কা থেকে রেহাই পেল আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিষয়টি এখানে শেষ হয়নি।

এককালের ছাত্রনেতা, বর্তমানে দলের পদ-পদবিবঞ্চিত একজন রাজনীতিকের জানাজায় হাজার হাজার মানুষের ঢল রীতিমতো ভুরুতে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে দলের নীতিনির্ধারকদের। চট্টগ্রামের প্রায় সব কটি দৈনিক পত্রিকার সচিত্র সংবাদের শিরোনামে ‘বিশাল’ জনতার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়াসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা জানাজায় উপস্থিত হয়ে আঁচ করতে পেরেছেন সোলেমানের জনপ্রিয়তা। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ছুটে গেছেন তাঁর শোকার্ত পরিবারের কাছে। অথচ তিনি দলীয় মনোনয়ন পাননি। বেঁচে থাকলে আজ দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সোলায়মানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠত দলের

প্রথম আলো

এর মধ্যে ১২ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে অনড় রয়েছেন। সুতরাং বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ আসছে পরে, আগে অন্তঃকোন্দলেই সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে অন্তত ১২টি ওয়ার্ডে

প্রয়াত সদ্য বিদায়ী কাউন্সিলরের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হলো দলের মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর জনপ্রিয়তাকে কতটা আমলে নিতে পেরেছেন নীতিনির্ধারকেরা, তা বোঝানোর জন্য। দলের সদ্য বিদায়ী ১৭ জন কাউন্সিলরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি এবারের নির্বাচনে। এর মধ্যে ১২ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে অনড় রয়েছেন। সুতরাং বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ আসছে পরে, আগে অন্তঃকোন্দলেই সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে অন্তত ১২টি ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংঘর্ষ ঘটেছে, প্রাণও হারিয়েছেন একজন দলীয় কর্মী।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিদ্রোহী প্রার্থীদের ভবিষ্যতে দলের পদ-পদবি দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও আওয়ামী লীগের নেতারা সবাই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন কি না, সেটাই বোঝার বিষয়। নগর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির বলেছিলেন, 'মনোনয়ন দেওয়ার সময় নগর কমিটির সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' কৌশলে বলা হয়েছে কথাটি। এই একটি কথায় অনুক্ত অনেক কিছুই বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আ জ ম নাছির উদ্দীনের যে দীর্ঘকালের বিরোধ, তার রেশ এখনো ফুরায়নি। মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে স্থানীয় এমপি ও উপমন্ত্রী মহিবুল হাসানের ছায়াতলে নাছির বিরোধীরা এখনো সক্রিয়।

সবচেয়ে বড় কথা, এই বিভক্ত দুটি উপদলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যর্থই বলা চলে। এর আগেরবারের সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে আ জ ম নাছিরকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার কিছুদিন আগেই তিনি পেয়েছিলেন দলের নগর সাধারণ সম্পাদকের পদ। কাউন্সিলর পদেও ছিল তাঁর সমর্থকদের সংখ্যাধিক্য। এবার দেখতে পাচ্ছি ঠিক উল্টো চিত্র। সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার পর নির্বাচিত মহিবুল হাসান চৌধুরী পেয়েছেন উপমন্ত্রীর পদ। এবারের সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আ জ ম নাছির নিজে মেয়র পদে মনোনয়ন তো পানইনি, উপরন্তু অধিকাংশ কাউন্সিলর প্রার্থীই মহিবুল হাসান সমর্থিত। এই ভারসাম্যহীনতা দলের কোন্দল জিইয়ে রাখার জন্য ইন্ধন জোগায়। এভাবেই হয়তো দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হন তারেক সোলেমানের মতো নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা।

নেতা-কর্মীদের মধ্যে মনোনয়ন নিয়ে ক্ষোভ-দুঃখ ভবিষ্যতে কীভাবে সামাল দেবেন, তা নীতিনির্ধারকদের ভাবনার বিষয়, তবে বিদ্রোহী প্রার্থীরা জয়ী হয়ে এলে যে তাঁদের প্রার্থী মনোনয়নই প্রশ্নের মুখে পড়বে এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

প্রথম আলো

পেরেছি আমরা।

সরকারি দলে থাকার বাড়তি সুবিধা সর্বজনবিদিত। কিন্তু অত্যাচার-জুলুম সয়েও জনমতকে নিজের দিকে ঘোরানোর সুযোগও বিরোধী দলের হাতে থাকে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সেই মনোবল বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে না। এ রকম নির্জীব, নিরাসক্ত ও হতাশ সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ জয় সত্যিই কঠিন।

আর মাত্র অল্প কয়েক দিন বাকি আছে নির্বাচনের। এই অতিমারির কালেও প্রচার-প্রচারণা, এমনকি উত্তেজনা-সংঘর্ষ কম কিছু ঘটেনি। বিএনপি মেয়র প্রার্থী ডা. শাহাদাত হোসেনের গাড়িবহরে অন্তত দুবার হামলা হয়েছে। পুলিশ প্রহরায় বিএনপি মেয়র প্রার্থীকে প্রচারণা করতে হচ্ছে, এমন দৃশ্য নগরবাসীর জন্য সুখকর নয়। এসব বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) অভিযোগ জানানো হলেও তদন্তের আশ্বাসের বেশি কিছু তৎপরতা ইসির পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। অবশ্য পাল্টা অভিযোগও আছে। বিএনপির নগর কার্যালয়ে একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার জন্য দুই দল পরস্পরকে দায়ী করেছে।

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিরোধী দলের মেয়র প্রার্থী ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কাউন্সিলরের জয়লাভের ঘটনা আমরা এই নগরে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। বিএনপি আমলে বিএনপি প্রার্থী মীর নাছিরকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মহিউদ্দিনকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী মনজুর আলম। কিন্তু কী আশ্চর্য, ইতিহাসের দিকে তাকালে যতটা উজ্জীবিত থাকার কথা, এই নির্বাচনে বিএনপি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের সে রকম উদ্দীপ্ত দেখা যাচ্ছে না। হারার আগে হেরে গেলে খেলাটা শুধুই ব্লেম গেমে পরিণত হতে পারে।

সম্প্রতি নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক কারচুপি, জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্র দখলের অভিযোগ আমরা শুনেছি। পত্রপত্রিকায় এমনকি শতভাগ ভোট প্রদানের 'রেকর্ড' নিয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনে অংশ নিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের অতীত ইতিহাস ঘেঁটে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বিএনপি নেতাদের। সরকারি দলে থাকার বাড়তি সুবিধা সর্বজনবিদিত। কিন্তু অত্যাচার-জুলুম সয়েও জনমতকে নিজের দিকে ঘোরানোর সুযোগও বিরোধী দলের হাতে থাকে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সেই মনোবল বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে না। এ রকম নির্জীব, নিরাসক্ত ও হতাশ সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ জয় সত্যিই কঠিন।

পরিবেশ থাকলে ভোটের মাঠ যে একতরফা হবে না, এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায়।

মতামত

আমরা কি টিকা তৈরি করতে পারি না?

লেখা হাসান মাহমুদ রেজা

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের উত্তরণ এখন বিশ্ব স্বীকৃত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দেশীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছিল না। ১৯৮২ সালে ড্রাগ (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের ওষুধশিল্প গতি ফিরে পায়। তারপর ৩৯ বছরের ইতিহাস শুধুই সামনে যাওয়ার। ছোট-বড় মিলিয়ে এ দেশে এখন নিবন্ধিত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭২টি। তবে নিয়মিত উৎপাদনে আছে এমন কোম্পানির সংখ্যা প্রায় ১৬০টি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ওষুধশিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার। স্থানীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধই এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। ওষুধের গুণগত মান ভালো থাকার কারণেই ইউরোপ, আমেরিকার রেগুলেটেড মার্কেটসহ বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে আমরা ওষুধ রপ্তানি করছি। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়। তবে ট্রেড রিলেটেড অ্যাস্পেক্টস অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস (ট্রিপস)-এর বাইরে থেকে বর্তমান ওষুধশিল্প যে সুবিধা ভোগ করছে, সেটি হয়তো ২০৩২ সালের পর থাকবে না। এ কারণে এ শিল্পের বিকাশকে ধরে রাখার জন্য এখনই শক্ত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনের প্রতি যেমন অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, তেমনি নতুন ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে নতুন ধরনের ওষুধ তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত এপিআই পার্কটি পূর্ণরূপে চালু হলে বাংলাদেশ ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবে। পাশাপাশি অধিক মুনাফাকাঙ্ক্ষী অসাধু ব্যবসায়ীরা যেন মানহীন ও

এগুলোর কাঁচামাল উৎপাদন, ফরমুলেশন, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন, সংরক্ষণ এমনকি প্রয়োগ পদ্ধতিও আলাদা। এ জাতীয় ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ওষুধ-বিজ্ঞানীদের যে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার, সেটি হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল বায়োটেকনোলজি। বর্তমানে যেসব ফার্মাসিস্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছেন, তাঁরা এ বিষয়ে কিছুটা শিক্ষালাভ করলেও সেটি যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসগুলোতে তাই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হওয়া খুবই জরুরি।

অন্যদিকে ওষুধশিল্পে বায়োটেকনোলজির মতো নতুন মাত্রা যোগ করে এ শিল্পের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনেক বেশি গবেষণা করতে হবে এবং কোম্পানিগুলোতে প্রয়োজনীয় গবেষণা অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বায়োটেকনোলজি প্রোডাক্টসের উৎপাদন করতে হলে আনুষঙ্গিক আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। না হলে এ-জাতীয় ওষুধগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের এই অগ্রগতি মূলত সম্ভব হয়েছে জেনেরিক ড্রাগসের ফিনিশসড ফরমুলেশন তৈরির মাধ্যমে। যদিও বর্তমানে ইনহেলেশন টেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি এবং দু-চারটি বায়োলজিক্সের ফিলিং শুরু হয়েছে, এগুলোকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমরা অতি দ্রুত যেকোনো ফরমুলেশন প্রোডাক্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছি, তবে টিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। টিকা তৈরির যথেষ্ট সক্ষমতা না থাকায় গত এক বছরে কোভিড-১৯ টিকা উৎপাদনে আমরা তেমন কোনো অবদান রাখতে পারিনি।

এ ক্ষেত্রে সামনের সারির কোম্পানিগুলোর মধ্যেও তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। একটি দেশীয় কোম্পানি টিকা তৈরিতে এগিয়ে এলেও এদেশে টিকা তৈরির সমন্বিত সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে এখনো এটি যৌক্তিক গতিতে এগোতে পারছে না। এ ছাড়া তাদের সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতাও অনেক কম।

গত এক বছরে এদেশের শীর্ষ ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর একটিও কোভিড-১৯ টিকা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সরকারি পর্যায়েও তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ গত এক বছরে অ্যাস্ট্রাজেনেকা নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন করে টিকা উৎপাদন করছে। চীনের সিনোভ্যাক তাদের উৎপাদনক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিশ্বখ্যাত সর্ববৃহৎ টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সেরাম ইনস্টিটিউট থাকা সত্ত্বেও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান টিকা তৈরিতে এগিয়ে এসেছে।

এ কথা বলা যাবে না যে এটিই শেষ মহামারি। আরও অনেক অজানা রোগ ভবিষ্যতে আসতে পারে। এসব কিছু মাথায় রেখে বড় পরিসরে বাংলাদেশে একটি টিকা তৈরির অবকাঠামো স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। সঙ্গে সঙ্গে টিকা

টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে এ দেশে কোভিড-১৯ টিকা উৎপাদনে আমরা অংশ নিতে পারতাম এবং দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য দেশে রপ্তানির একটা সুযোগ সৃষ্টি হতো।

এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত দুটি প্রতিষ্ঠান মডার্না এবং বায়োএনটেক কোভিড-১৯ টিকা উৎপাদনের মধ্য দিয়েই তাদের সক্ষমতা এবং ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে বাংলাদেশের ওষুধশিল্প ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছে, সেখানে এ দেশের প্রথম সারির দু-একটি কোম্পানি একটু ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-১৯ টিকা তৈরির চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে টিকার বাজারেও বাংলাদেশের ওষুধশিল্প বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারত।

এ কথা বলা যাবে না যে এটিই শেষ মহামারি। আরও অনেক অজানা রোগ ভবিষ্যতে আসতে পারে। এসব কিছু মাথায় রেখে বড় পরিসরে বাংলাদেশে একটি টিকা তৈরির অবকাঠামো স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। সঙ্গে সঙ্গে টিকা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোও স্থাপন করতে হবে। অন্তত দেশে এই মুহূর্তে কয়েকটি বায়োসেফটি লেভেল-৩ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। হাতে গোনা দু-একটি কোম্পানি সীমিত আকারে দু-একটি টিকা উৎপাদন করলেও সম্পূর্ণ টিকা তৈরির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপিত হয়নি।

আশা করি, বাংলাদেশের ওষুধশিল্প আগামী দিনে টিকা এবং অধিক বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনের মাধ্যমে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

ড. হাসান মাহমুদ রেজা : অধ্যাপক ও ডিন, স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।

মতামত

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা কি জমিদার

সোহরাব হাসান

প্রথম আলো

তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক অবস্থা চলছে—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আজকের লেখায় খুলনা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই থাকবে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে পরে লেখা হবে।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার প্রকৃতি ও ধরন আলাদা হলেও প্রতিটির সঙ্গে উপাচার্য ও প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা, দলবাজি, স্বজনপ্রীতি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মতো নয়। জ্ঞানদান ও জ্ঞান সৃষ্টির সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দলমত-নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যে যাঁর অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখবেন, সে রকমই প্রত্যাশিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা উপাচার্য হয়ে আসেন, তাঁরা হাবেভাবে দেখাতে চান, ক্যাম্পাস তাঁর জমিদারি। তিনি ক্যাম্পাসে থাকুন আর না-ই থাকুন, তাঁর কথায় ও অঙ্গুলি হেলনে সবকিছু চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন, বিধি-নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁর ইচ্ছা। কোনো কোনো উপাচার্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার চেয়ে চার বছরের ‘জমিদারি’ রক্ষার কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তিয়াত্তরের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তিয়াত্তরের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। উপাচার্য আবদুস সোবহান দ্বিতীয় মেয়াদে আসার পর নিজের পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিতে আইন অগ্রাহ্য করে নিয়োগবিধি সংশোধন করলেন। এর প্রতিকার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ দেড়েক শিক্ষক আচার্য ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনে চিঠি লেখেন। ইউজিসির তদন্তে এসব অভিযোগের সত্যতা বেরিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছরের ১০ ডিসেম্বর উপাচার্যকে কৈফিয়ত তলব করে এবং কিছু নির্দেশনা দেয়। নির্দেশনাগুলো হলো : ১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা, ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭ সালের নিয়োগ নীতিমালা বাতিল করে ১৯৭৩-এর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন, ৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়মবহির্ভূতভাবে দখলে রাখা ডুপ্লেক্স বাড়ির ভাড়া ৫ লাখ ৬১ হাজার ৬০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া এবং ৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এম এ বারীকে অসদাচরণের জন্য রেজিস্ট্রার পদ থেকে অব্যাহতি।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এম এ বারী পদত্যাগ করেছেন। বাকি কোনো নির্দেশনা উপাচার্য কার্যকর করেননি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে আন্দোলনকারীদের ভয়ে উপাচার্যকে রাতের আঁধারে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আগে যাঁরা ছাত্ররাজনীতি করতেন, তাঁরা পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। আর এখন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তৃতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য উপাচার্যের কাছে ধরনা দেন, প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফায়েকুজ্জামানের দ্বিতীয় মেয়াদ চলতি মাসের ২৮ তারিখ শেষ হওয়ার কথা। এর মধ্যে তিনি অনেক অঘটনের জন্ম দিয়েছেন। করোনাকালে তিনি তিন শিক্ষকের চাকরি খাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন, দুই শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছেন। এর আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষককে দেওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছিল ‘স্বাভাবিক একাডেমিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করা, শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অসৌজন্যমূলক আচরণ, প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আটকে রাখা ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছিল বেআইনি, অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।’

১ ও ২ জানুয়ারি যখন শিক্ষার্থীরা হাদী চত্বরে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছিলেন, তখন দুই শিক্ষক কেন সেখানে গাড়ি চালিয়ে গেলেন? কেন বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা সেখান থেকে সরে গেলেন না? তাহলে উসকানি কারা দিয়েছেন—আন্দোলনের প্রতি সমর্থনদানকারী চার শিক্ষক, না অবরোধ ভাঙতে আসা দুই শিক্ষক?

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে চারজন শিক্ষকের ‘সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে’ মর্মে ব্যাখ্যা দাবি করা হয়েছে। একটি ঘটনার কোনো রূপ তদন্ত ছাড়াই সংশ্লিষ্টতা ‘প্রতীয়মান হয়েছে’ বলার উদ্দেশ্য কী? সেই চার শিক্ষকের একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় তিনি চাকরিচ্যুতি থেকে আপাতত রেহাই পাচ্ছেন। বাকি তিনজনের মাথায় চাকরিচ্যুতির খড়্গ ঝুলছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার মধ্যে তিন শিক্ষককে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল। শিক্ষকেরা জবাব দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই দেখার বিষয়।

গত বছরের ১ ও ২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুচিকিৎসা, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ, বেতন-ফি কমানো, অবকাঠামো নির্মাণে দুর্নীতির প্রতিকার, শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী অধ্যাদেশের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। এসব দাবির কোনটি অযৌক্তিক? উপাচার্য কি চান না ক্যাম্পাসে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা হোক? ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের অর্থ এই নয় যে সেখানে কেউ সংস্কৃতি চর্চা করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে

অভিযুক্ত দুই শিক্ষার্থী কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে তদন্ত কমিটির কাছে জানতে চেয়েছিলেন অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন কয়েক শ শিক্ষার্থী, তাঁদের মধ্য থেকে দুজনকেই কেন নোটিশ দেওয়া হলো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, তঁারা শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। কিন্তু সে জন্য একতরফা শিক্ষার্থীদের দায়ী করা যায় না। অবরোধস্থলে গাড়ি চালিয়ে আসা দুই শিক্ষককেও এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। উপাচার্য ও ওই দুই শিক্ষক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন তাঁরা ন্যায্য দাবিতে ক্যাম্পাসে কোনো আন্দোলন যোগ না দিলেও নিশ্চয়ই সতীর্থদের আন্দোলন দেখেছেন। দমনপীড়ন বা বহিষ্কারাদেশ দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিবৃত্ত করা যায় না। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নোমানকে এক বছরের জন্য এবং ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ইমামুলকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে। এর প্রতিবাদে তাঁরা গত মঙ্গলবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁকে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে। অপর শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থাও অবনতির দিকে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ধরনের চিকিৎসা সহায়তা না দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পদাধিকারীর সেখানে না যাওয়া অমানবিক। সাধারণ শিক্ষার্থীরাই বাইরে থেকে চিকিৎসক এনে অনশনরত দুই শিক্ষার্থীর চিকিৎসা করিয়েছেন। বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এসে তাঁদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। অনশন কর্মসূচির আগে ওই দুই শিক্ষার্থীর একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'আমার অনশনের খবর শুনে পরিবারের সদস্যদের কিছু হলে তার দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।'

সর্বশেষ খবর হলো গতকাল দুপুরে খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বক্তব্য শুনেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গেও তাঁর বসার কথা। হয়তো একটি সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বিদায়বেলায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফায়েকুজ্জামান যে নজির রেখে গেলেন, তা শিক্ষা ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও জন্য মঙ্গলজনক নয়। গৌরবের তো নয়ই।

সোহরাব হাসান : *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

sohrabhassan55@gmail.com

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

কোনো জাতি ধ্বংস হওয়ার আগে তাদের সন্তানদের শৈশব ধ্বংস হয়ে যাবে। যত কাল পর্যন্ত কোনো জাতির শিশুদের কৈশোর ও তারুণ্য নিরাপদ থাকবে, তত দিন সে জাতি উন্নতি করতে থাকবে। হজরত নুহ (আ.) বলেছিলেন, 'হে আমার রব! পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞদের একটি গৃহও রেখো না। যদি তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তবে তারা তোমার বান্দাদের বিপথগামী করবে এবং তারা অপরাধী ও পাপী সন্তানই জন্ম দেবে।' (সুরা-৭১ নুহ, আয়াত : ২৬-২৭)। তারা পাপী-বিপথগামী হলেও যদি তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে সে জাতি সমূলে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেত। তাই আমাদের মানবসভ্যতার রক্ষার জন্য শিশুদের শৈশবকে পঙ্কিলতা ও আবিলতামুক্ত রাখতে হবে। সভ্যতার উন্নয়নের জন্য আমাদের শিশুদের উন্নত চিন্তা ও পবিত্র জীবনের দীক্ষা দিতে হবে।

সন্তানের শৈশব সুন্দর হলে সে ইহকাল ও পরকালে গর্বের ধন হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা এমন নারীদের বিয়ে করো, যারা অধিক সন্তানপ্রিয়। আমি তোমাদের সুসন্তানের জন্য রোজ কিয়ামতে গর্বিত হব।' (নাসায়ি : ৩২২৭, আবুদাউদ : ২০৫০)।

আল্লাহ তাআলা অনাগত সন্তানের জন্য দোয়া ও শুভকামনা শিখিয়েছেন। 'হে আমার প্রভু! আমাকে সুসন্তান দান করুন।' (সুরা-৩৭ ছফফাত, আয়াত : ১০০)। 'হে আমার প্রভু! আমাদের সাথিদের ও আমাদের সন্তানদের আমাদের জন্য চোখের শীতলতায় পরিণত করুন, আর আমাদিগকে মুত্তাকিনদের প্রধান করুন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫)। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, আর আমাদের বংশধরদিগকেও আপনার অনুগত করুন; আপনার বিধান আমাদের প্রত্যক্ষ করান এবং আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করুন! নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১২৮)।

সন্তান যেন বার্ধক্যে পিতা-মাতাকে নিঃসঙ্গ ফেলে না রাখে, সে জন্য প্রার্থনা, 'হে আমার প্রভু! আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না, আপনিই তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী দাতা।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮৯)। সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন উত্তম পারিবারিক পরিবেশ। আল্লাহ তাআলা তা-ও বলে দিলেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে উত্তম পরিবার দান করুন, নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।' (সুরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮)। 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান করুন, আর দোজখের আজাব হতে আমাদের রক্ষা করুন।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ২০১)।

প্রকাশ করুন। আমরা তাদিগকে আমাদের পদতলে পিষ্ট করব, যাতে তারা হীন লাঞ্ছিত অপমানিত হয়।' (সুরা ৪১ হা-মিম আস সাজদাহ, আয়াত : ২৯)।

শিশুর নৈতিক শিক্ষার সব ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তার দুনিয়া ও আখিরাত মঙ্গলময় হয়। শিশুকে শিষ্টাচার শেখাতে হবে, যাতে তার আচার-আচরণ সুন্দর হয় এবং সমাজে সবার ভালোবাসা ও সহানুভূতি লাভ করে। শিশুকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ ও অকল্যাণ বোঝাতে হবে, যাতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, নামাজসহ ইবাদতে অভ্যস্ত করতে হবে, যাতে মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। কোরআন, হাদিস ও ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত মনীষীদের গল্প শোনাতে হবে। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝাতে হবে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ও সমাজের সবার সঙ্গে মেশার সুযোগ তৈরি করতে হবে। খেলাধুলা ও সৃজনশীল কাজের চর্চা বাড়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে রয়েছে, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করো এবং তাদের ভালো ব্যবহার শেখাও।' (বুখারি)। 'সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান-খয়রাতের চেয়েও উত্তম।' (ইবনে মাজাহ)।

সন্তানদের নিরাপদ ও আনন্দময় শৈশবের জন্য পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সব স্তরের সচেতন নাগরিকেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর এ ব্যাপারে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।' (বুখারি)। রাসুল (সা.) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি কাজের প্রতিদান পেতে থাকে। এমন দান যার কল্যাণ চলমান থাকে, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে, এমন সৎকর্মশীল সন্তান, যে তার (পিতা-মাতা ও অভিভাবকের) জন্য দোয়া করে।' (ইবনে কাসির)।

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

smusmangonee@gmail.com

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২১ প্রথম আলো